 প্রবন্ধাবলি, খণ্ড : ১০, জুলাই ২০১৮, ৪২:৫৯

ময়নামতি জাদুঘরে সংরক্ষিত ভাস্কর্যে হিন্দু দেবদেবী একটি পর্যালোচনা

কালিদাস ভক্ত[১]

সারসংক্ষেপ

আমাদের দেশের প্রত্নতাত্ত্বিক স্থানগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো বৃহত্তর কুমিল্লা জেলার ময়নামতি। ঐতিহাসিকদের মতে রাজা মানিকচন্দ্রের স্ত্রী ময়নামতির নামানুসারে ময়নামতি নামকরণ করা হয়। সে হিসেবে এর ঐতিহাসিক গুরুত্বও রয়েছে। প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনে সমৃদ্ধ কুমিল্লার ময়নামতিতে বিভিন্ন বিহার খননের ফলে অনেক মূল্যবান নিদর্শন পাওয়া গেছে। তাছাড়া বৃহত্তর কুমিল্লায় সামাজিকভাবে ও ব্যক্তি পর্যায়ে মন্দিরে মন্দিরে এবং ঘরে ঘরে নানা ধরনের প্রত্নসম্পদ পাওয়া গেছে, সেগুলো সংগ্রহ করে ময়নামতি জাদুঘরে সংরক্ষণ করা হয়েছে। এই প্রত্নসম্পদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য বিভিন্ন ধরনের ভাস্কর্য রয়েছে। ভাস্কর্যসমূহের মধ্যে নানা ধরনের বৌদ্ধ ভাস্কর্য, বৌদ্ধদের দেবতা ও হিন্দু দেবদেবীর ভাস্কর্য রয়েছে। তবে ভাস্কর্যসমূহ জাদুঘরে সংরক্ষিত থাকলেও হিন্দু দেবদেবীর ভাস্কর্য সম্পর্কে আলাদাভাবে শ্রেণিকরণ ও বিস্তারিত বিবরণ নেই। আলোচ্য প্রবন্ধে এসব প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের মধ্য থেকে ময়নামতি জাদুঘরের হিন্দু দেবদেবীর ভাস্কর্য সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা উপস্থাপন করা হয়েছে।

মূল শব্দ : ময়নামতি জাদুঘর; দেবদেবী; হরগৌরী; গণেশ; সূর্য।

কুমিল্লা পুরাতত্ত্ব সমৃদ্ধ অঞ্চল। এ অঞ্চলে রয়েছে প্রাচীন শিক্ষা-শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির অনন্য দৃষ্টান্ত। অপরদিকে উপমহাদেশের প্রাচীন ঐতিহ্যপূর্ণ বিখ্যাত জেলা হিসেবে কুমিল্লা সর্বজন বিদিত। প্রাচীন বাংলার সাতটি জনপদের মধ্যে অন্যতম জনপদ হিসেবে বৃহত্তর কুমিল্লা সমতট অঞ্চলের অন্তর্গত। পূর্ব ও দক্ষিণ বাংলার প্রাচীন নাম সমতট। 'চতুর্থ শতাব্দীর মধ্যভাগে রচিত গুপ্তসম্রাট সমুদ্রগুপ্তের প্রশস্তিতে সমতট নামক দেশটির প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায়। সমতট তাঁর সাম্রাজ্যের প্রত্যন্ত রাষ্ট্র ছিল। ষষ্ঠ শতাব্দীতে বরাহমিহিরের 'বৃহৎসংহিতা'তে (১৪/৬-৮) বঙ্গ ও সমতটের স্বতন্ত্র উল্লেখ দেখা যায়' (সরকার ২০১৫ : ৪৭)। সপ্তম শতকে হিউয়েন সাং বাংলা ভ্রমণকালে সমতটের উল্লেখ করেন। তখন এ অঞ্চল সমুদ্রের নিকটে, নিচু ও আর্দ্র ছিল। বৌদ্ধ সংস্কৃতির কেন্দ্র হিসেবে ৫.৫ কিলোমিটার আয়তন বিশিষ্ট রাজধানীর চিত্রও তিনি তুলে ধরেন। পরবর্তীতে ইৎসিং সমতটের অবস্থান সম্পর্কে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রদান করেন। তাঁর বর্ণনানুসারে সপ্তম শতকের দ্বিতীয়ার্ধে এ অঞ্চলের শাসক ছিলেন রাজভট্ট। ইনিই খড়গ বংশের রাজরাজভট্ট নামে পরিচিত। তাঁর রাজধানী ছিল কর্মান্তবাসক।

[১]সহকারী অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। ই-মেইল : kalidasbhakta@yahoo.com

কুমিল্লার কৈলান এলাকা থেকে প্রাপ্ত শ্রীধারণ রাতের তাম্রশাসনে রাজাকে সমতটেশ্বর হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে, যাঁর রাজধানী ছিল দেবপর্বতে। অষ্টম শতেকেও এটি দেবরাজাদের রাজধানী ছিল। এর পরবর্তীতে চন্দ্ররাজাদের তাম্রশাসনেও দেবপর্বত ও সমতটের বর্ণনা পাওয়া যায়। এ প্রসঙ্গে ইতিহাসবিদ চৌধুরী (২০০৪:৩৫) বলেন– 'এখন সন্দেহাতীৎ যে, লালমাই পাহাড় ও ময়নামতিতে প্রাপ্ত ধ্বংসাবশেষের সঙ্গে দেবপর্বতের সম্পৃক্ততা ছিল। ত্রয়োদশ শতাব্দীর দামোদরদেব-এর মেহার তাম্রশাসনের মাধ্যমে, মেহার (কুমিল্লার ১৪.৫ কিমি দক্ষিণ-পূর্বে)-এর সন্নিকটে যে ভূমি দান করা হয়, তা ছিল সমতট মণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত।'

ঐতিহ্যবাহী এ অঞ্চলে কালের বিবর্তনের ধারায় অনেক কিছুরই পরিবর্তন হয়েছে। তবে তা সত্ত্বেও নিদর্শনসমূহ রয়ে গেছে। Morrison (1980) প্রাচীন বাংলার বিভিন্ন তাম্রশাসন ও নিদর্শনসমূহকে উৎস হিসেবে নিয়ে বাংলার রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্রগুলোর ইতিহাস পুনর্গঠন করেন। এর মধ্যে তিনি সমতটকে একটি গুরুত্বপূর্ণ জনপদ হিসেবে তুলে ধরেন। বৌদ্ধধর্মের পাশাপাশি হিন্দুধর্ম সমতট অঞ্চলে প্রভাবশালী ধর্ম হিসেবে প্রতিষ্ঠিত ছিল– যা তাঁর গবেষণায় ফুটে উঠেছে। কুমিল্লা ছিল এই সমতটের প্রাণকেন্দ্র। সমতট অঞ্চল থেকে প্রাপ্ত নিদর্শনগুলোই ময়নামতি জাদুঘরে সংরক্ষিত রয়েছে।

অমিতাভ ভট্টাচার্য সমতট সম্পর্কে বলেন–

Samatata is mentioned in the Allahabad Pillar inscription of Samudragupta along with Davaka, Kamarpura, Nepala, Karttrpura and others as a frontier state of the Gupta empire. The Brhatsamhita refers to it as distinguished from Vanga. (Bhattacharyya 1977: 65)

সমসাময়িক কালেও কুমিল্লার প্রত্নতাত্ত্বিক স্থানগুলোর উপর গবেষণায় নানা তথ্য উন্মোচিত হয়েছে। এ সম্পর্কে *প্রত্ননিদর্শন : কুমিল্লা* গ্রন্থে বেগম (২০১০: ১৮৫) বলেন–

> কুমিল্লায় এ পর্যন্ত খননে যে সব বৌদ্ধ বিহার ও অন্যান্য স্থাপনা এবং প্রত্নবস্তু উন্মোচিত হয়েছে তা আমাদের ইতিহাস ও ঐতিহ্য গঠনে অতি মূল্যবান সম্পদ। এখানে একই স্থানে এতগুলো বৌদ্ধ বিহারের সন্ধান পৃথিবীর পুরাকীর্তী গবেষণার ক্ষেত্রে এক অমূল্য ভাণ্ডার। বলা বাহুল্য কুমিল্লার প্রত্ননিদর্শন কেবল কুমিল্লা জেলায় কিংবা বাংলাদেশে নয় সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

১৭৩৩ সালে বাংলার নবাব শুজাউদ্দিন ত্রিপুরা রাজ্য আক্রমণ করে এর সমতট অংশ সুবে বাংলার অন্তর্ভুক্ত করেন। ১৭৬৫ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এ অঞ্চল দখল করে। কুমিল্লা এক সময় ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৭৯০ সালে কোম্পানী শাসনামলে ত্রিপুরা নামে জেলা সৃষ্টি হয়। পরবর্তীতে ১৯৬০ সালে এ জেলার নাম দেওয়া হয় কুমিল্লা। ১৯৮৪ সালে বৃহত্তর কুমিল্লা জেলা বিভক্ত হয়ে নবগঠিত তিনটি জেলা– কুমিল্লা, চাঁদপুর ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া নামে পরিচিতি লাভ করে। কুমিল্লা নগরী যে কারণে সুবিখ্যাত হয়েছে সেটি হলো প্রাচীন সভ্যতার লীলাভূমি ময়নামতি। খ্রিষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকে এ অঞ্চলে বসতি গড়ে উঠেছিল। কুমিল্লা শহর থেকে সাত কিলোমিটার পশ্চিমে কোটবাড়ি এলাকায় ময়নামতি অবস্থিত। এই শৈলশ্রেণির দৈর্ঘ্য উত্তর-দক্ষিণে ১৭.৬০ কিলোমিটার, প্রস্থ পূর্ব-পশ্চিমে ১.৫০ কিলোমিটার হতে ২.৫০ কিলোমিটার এবং উচ্চতা ১৫.১৫ মিটার। উত্তরদিকের শেষ সীমানা রাণীর বাংলোর পাহাড় আর দক্ষিণদিকের শেষ সীমানা চণ্ডীমুড়া পর্যন্ত। এই সীমানার মধ্যেই প্রত্নসম্পদের বিশাল সমাহার সঞ্চিত রয়েছে। এখানে ১৯৫৫ সালে

প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর সার্ভে করে মোট পঞ্চান্নটি প্রত্নস্থল চিহ্নিত করেছে। তারপর থেকে বিভিন্ন সময়ে খননের ফলে অমূল্য প্রত্নসম্পদ পাওয়া যায়, যেগুলো গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস-ঐতিহ্যের দালিলিক প্রমাণ। সেগুলো হলো – তাম্রলিপি, পাণ্ডুলিপি, শিলালেখ-অভিলেখ, দানপত্র, প্রশস্তিপত্র, নানা ভঙ্গিতে নারীপুরুষ, পশুপাখি, স্বর্ণমুদ্রা, রৌপ্যমুদ্রা, পাথরের ভাস্কর্য, ব্রোঞ্জের ভাস্কর্য, ঘন্টা, তৈজসপত্র প্রভৃতি নানা প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন। এখানে ভাস্কর্যসমূহের মধ্যে বৌদ্ধ ভাস্কর্যের সংখ্যাই বেশি। তবে হিন্দু ও জৈন দেবদেবীর ভাস্কর্যও পাওয়া গেছে। ময়নামতিতে প্রাপ্ত প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন ছাড়াও বৃহত্তর কুমিল্লায় যে ধরনের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন পাওয়া গেছে, সেগুলো সংগ্রহ করে ময়নামতি জাদুঘরে সংরক্ষণ করা হয়েছে। বৃহত্তর কুমিল্লার তিনটি জেলায়ই ভারত ভাগের আগ পর্যন্ত হিন্দু অধ্যুষিত ছিল। সে হিসেবে ধর্মপ্রাণ হিন্দুরা বিভিন্ন দেবদেবীর পূজা মহাধুমধামে পালন করত : 'বৃহত্তর কুমিল্লার প্রাচীন মন্দিরসমূহ দেখলে তার প্রমাণ পাওয়া যায়' (বেগম ২০১০ : ২৫)। বিভিন্ন মনীষী এই মূর্তি তৈরির পেছনে নানা মত ব্যক্ত করেছেন। প্রত্নতত্ত্ববিদ হোসেনের (২০১৯ : ১৭) মতে– 'যুগ বিবর্তনের সাথে সাথে তাদের সংস্কৃতি বলয়ে উর্বরতা চর্চাকে আশ্রয় করে ধীরে ধীরে হাজারো দর্শনের গ্রন্থন-মন্থন অব্যাহত ছিল। আর ঐসব দর্শনের আবহে লালিত করে এই মানুষেরা পালাক্রমে অগুণিত বৈচিত্র্যময় মূর্তি গড়েছে।' অপরপক্ষে ভট্টাচার্য মনে করেন–

> নিরাকার এক অদ্বিতীয় ঈশ্বরের ধারণা সাধারণ মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। সেজন্যই নিরাকার ব্রহ্মকে সাকাররূপে কল্পনা করে মানুষ তৃপ্তি পায়। ঈশ্বরের প্রতীক উপাসনা তাই মানুষের মধ্যে বহুল প্রচলিত। ভারতীয় আর্যরা মানুষের সীমাবদ্ধ শক্তি সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। সেইজন্য অসীম অনন্ত ঈশ্বরকে তাঁরা সসীম আকারে আবদ্ধ করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। মৃন্ময়ী, দারুময়ী অথবা প্রস্তরময়ী প্রতীমার প্রতীকে উপলব্ধি করার সাধনা ভারতীয় আর্যসমাজে মূর্তি গড়ে পূজা করার রীতি সুপ্রাচীন কাল থেকেই প্রচলিত। (ভট্টাচার্য ১৯৮২ : ৩০)

প্রত্নতত্ত্ববিদ আহমেদ (১৯৯৭) ময়নামতি সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন – ময়নামতি পাহাড়ের সর্বোচ্চ চূড়ায় ঘন জঙ্গলাচ্ছাদিত অবস্থায় চতুষ্কোণ একটি ইট নির্মিত দুর্গ আছে এবং তার সান্নিধ্যে সুন্দরভাবে নির্মিত হিন্দু দেবদেবীর বহু ভাস্কর্য দেখা যায়।[১০]

আলোচ্য প্রবন্ধে ময়নামতি যাদুঘরে যে ধরনের হিন্দু দেবদেবীর ভাস্কর্য রয়েছে সে সম্পর্কে আলোচনার পূর্বে হিন্দুদের দেবদেবী সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা প্রয়োজন। হিন্দুধর্মে ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয়; তাঁর কোনো আকার নেই। তিনি যখন নিজের গুণ বা ক্ষমতাকে আকার দান করেন, তখন তাঁকে দেবতা বলে।'দিব্' ধাতু থেকে দেব, দেবী বা দেবতা শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে। যিনি প্রকাশ পান তিনি দেবতা। ঈশ্বর যে রূপে সৃষ্টি করেন তাঁর নাম ব্রহ্মা। যে রূপে পালন করেন তাঁর নাম বিষ্ণু। যে রূপে ধ্বংস করেন তাঁর নাম শিব। দুর্গা শক্তির দেবী, সরস্বতী বিদ্যার দেবী, লক্ষ্মী ধনের দেবী। এরকম আরও অনেক দেবদেবী আছে, যেমন – সূর্য, হরগৌরী, মহিষমর্দিনী, মনসা, গণেশ, কার্তিক, লক্ষ্মী, সরস্বতী প্রভৃতি। *রামায়ণ*, *মহাভারত*, *পুরাণ*-এর অনেক চরিত্র দেবদেবী হিসেবে স্তুত। ভক্তগণ মনের সকল অভিলাষ পূর্ণ করার প্রয়াসে মূর্তিতে যুগ যুগ ধরে পূজা করে আসছেন। হিন্দুধর্মে তিন প্রকার দেবতার পরিচয় পাওয়া যায়, যথা– ১. বৈদিক দেবতা ২. পৌরাণিক দেবতা ৩. লৌকিক দেবতা। বেদে যে সমস্ত দেবতার কথা বলা হয়েছে তাঁদের বৈদিক দেবতা বলে, যেমন – অগ্নি, ইন্দ্র, মিত্র, রুদ্র, বরুণ, বায়ু, সোম প্রভৃতি। বৈদিক দেবী হিসেবে সরস্বতী, ঊষা, অদিতি, রাত্রি প্রভৃতি। বৈদিক দেবতাদের কোন মূর্তি ছিল না। দেবতাদের শরীর ছিল মন্ত্রময়। বেদে দেবতাদের তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে, যথা –কে) স্বর্গের দেবতা খ) অন্তরীক্ষ লোকের দেবতা গ) মর্ত্য লোকের দেবতা। যে দেবতারা স্বর্গলোকে অবস্থান করেন তাঁরা স্বর্গের

দেবতা, যেমন – সূর্য, যম, বরুণ প্রভৃতি। স্বর্গ ও মর্ত্যের মাঝামাঝি যে দেবতারা অবস্থান করেন তাঁরা অন্তরীক্ষ লোকের দেবতা, যেমন – ইন্দ্র, বায়ু প্রভৃতি। মর্ত্য লোকে বা পৃথিবীতে যে দেবতারা অবস্থান করেন তাঁরা মর্ত্য লোকের দেবতা, যেমন – অগ্নি। পুরাণে যে সমস্ত দেবতার বর্ণনা করা হয়েছে, তাঁদের পৌরাণিক দেবতা বলা হয়, যেমন – ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, গৌরী, সরস্বতী প্রভৃতি। পুরাণে বৈদিক দেবতাদের অনেকের রূপের পরিবর্তন ঘটেছে, অনেক নতুন দেবতার আবির্ভাব ঘটেছে। পৌরাণিক যুগ থেকেই দেবতাদের বিগ্রহ বা মূর্তি নির্মাণ করা হয়েছে। ধ্যানলব্ধ দেবতাদের তৈরী করা হয়েছে ধ্যানানুসারী মূর্তি। বেদের বিষ্ণুকে দেখি পুরাণে শঙ্খ-চক্র-গদা- পদ্মধারী ঘনশ্যাম বিষ্ণুরূপে। এছাড়াও সূর্য, অগ্নি, ইন্দ্র, বরুণ প্রভৃতি বৈদিক দেবতার উল্লেখ পুরাণেও রয়েছে। মন্ত্রে যেভাবে দেব-দেবীর বর্ণনা করা হয়েছে, সেভাবে তাঁদের মূর্তি নির্মাণ করা হয়েছে। পৌরাণিক যুগে মন্দির নির্মাণ করে তাতে দেবদেবীর মূর্তি স্থাপন করে পূজা করার পদ্ধতি প্রচলিত রয়েছে। বেদে ও পুরাণে যে সমস্ত দেবতার কথা বলা হয়নি, কিন্তু ভক্তগণ তাঁদের পূজা করেন, তাঁদের বলা হয় লৌকিক দেবতা, যেমন- মনসা, নন্দী, শীতলা, ক্ষেত্রদেবতা, দক্ষিণ রায় প্রভৃতি। পরবর্তীকালে মনসা দেবীসহ আরও অনেক লৌকিক দেবতা পুরাণেও অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। কুমিল্লার ময়নামতি জাদুঘরে বৈদিক, পৌরাণিক, লৌকিক এই তিন শ্রেণির হিন্দু দেবদেবীর মূর্তিই পাওয়া গেছে।

প্রত্নবস্তুর সংরক্ষণ এবং জনগণের মাঝে প্রদর্শনের জন্য ১৯৬৫ সালে শালবন বিহারের দক্ষিণ পাশে একটি জাদুঘর স্থাপন করা হয়েছে, সেটিই ময়নামতি জাদুঘর। জাদুঘরটি উত্তর-দক্ষিণে লম্বালম্বিভাবে শালবনকে সামনে রেখে পশ্চিমমুখী করে অবস্থিত রয়েছে। এই মূল জাদুঘর ভবনে প্রত্নবস্তু প্রদর্শনের জন্য স্থান সাংকুলান না হওয়ায় ১৯৭০-৭১ অর্থবছরে সেটির দক্ষিণ পাশ বর্ধিত করা হয়েছে, যার ফলে ভবনটি 'টি' বর্ণের আকার ধারণ করেছে। জাদুঘর ভবনে ১.৮৩মি. x ১.২২মি. x ৬১মি. পরিমাপের দেয়ালের সাথে লাগানো মোট ৪২টি আধার রয়েছে। প্রবেশদ্বারের বামদিক দিক থেকে প্রদর্শনী আধার ১ থেকে আরম্ভ হয়ে ক্রমানুসারে চারদিকে ঘুরে ঘুরে প্রবেশদ্বারের ডান দিকে মোট ৪২ টি প্রদর্শনী আধার দিয়ে শেষ হয়েছে।

এখানে প্রদর্শিত হিন্দু দেবদেবী, যেমন – হরগৌরী, গণেশ, সূর্য, ত্রিবিক্রম বিষ্ণু, হেরুক, মারীচী, নন্দী, মহিষমর্দিনী, মনসা, তারা। এই মূর্তিগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।

হরগৌরী

শিবের আরেক নাম হর। তিনি দুঃখ-তাপ হরণকারী তাই তিনি হর। তিনি সংহার কর্তা। ঈশ্বর যে দেবতারূপে সংহার বা ধ্বংস করেন তাঁর নাম শিব। আর গৌরী হলো মহাদেবী দুর্গা-পার্বতীর এক নাম । ময়নামতি জাদুঘরে সংরক্ষিত বর্ণনানুসারে–

> মূর্তিটি কালোপাথর ছেঁটে গড়া। মূর্তিটির পরিমাপ ৬১ সেমিঃ x ২৯ সেমিঃ। ললিতাসনে উপবিষ্ট হর (শিব) এবং তাঁর বাম উরুর উপর ললিতাসনে উপবিষ্ট গৌরী (পার্বতী)। শিব হিন্দুদের দ্বারা সৌভাগ্য কামনায় পূজিত হতেন। মূর্তিটি আনুমানিক একাদশ/দ্বাদশ শতকের রীতিবৈশিষ্ট্য বহন করছে। (জাদুঘর ৩২:৩৮১)

মূর্তিটি কুমিল্লার পুলিশ সুপারের সৌজন্যে কুমিল্লা জেলার চান্দিনা থানার বাবেড়া গ্রাম থেকে সংগৃহীত। প্রকৃতপক্ষে এটি শিব মঙ্গলের দেবতা। মঙ্গলের জন্য তিনি ধ্বংস করেন। তিনি ধ্বংস করে সমতা রক্ষা করেন। তিনি দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করেন। তিনি চিকিৎসাশাস্ত্র, নাট্যশাস্ত্র ও নৃত্যশাস্ত্রসহ

বহু বিদ্যায় পারদর্শী। বেদে সরাসরি শিবের উল্লেখ না থাকলেও শিবের অনুরূপ একজন দেবতার উল্লেখ আছে, তাঁর নাম রুদ্র। রুদ্র শত্রুপক্ষের বীরদের বিনাশ করেন, তিনি রোগ-ব্যাধি হরণ করেন। *পুরাণে* শিবকে মহাদেব বলা হয়েছে। শিব ত্রিমূর্তির অন্যতম। লৌকিক দেবতারূপেও শিবের পূজা প্রচলিত আছে। শিবের গায়ের রং তুষারের মত সাদা। তাঁর মাথায় জটা আছে। তাঁর তিনটি চোখ। একটি চোখ কপালের মাঝখানে। এটি জ্ঞান চোখ নামে খ্যাত। তাঁর মাথার এক পাশে একটি বাঁকা চাঁদ রয়েছে। শিবের হাতে থাকে ডমরু ও শিঙ্গা নামক বাদ্যযন্ত্র এবং ত্রিশূল নামক অস্ত্র। তাঁর গলায় থাকে রুদ্রাক্ষের মালা। এছাড়া সর্প তাঁর অঙ্গের অলঙ্কার। শিবের বাহন বৃষ। শিবের অনেক নাম, যেমন – মহাদেব, ত্রিপুরারি, ভোলানাথ, বৈদ্যনাথ, নীলকণ্ঠ, আশুতোষ ইত্যাদি। শিব পঞ্চ দেবতার অন্যতম। সকল দেবতার পূজা করার সময় শিব পূজা করা হয়। তবে বিশেষভাবে ফাল্গুন মাসের কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশী তিথিতে ঘটা করে শিবের পূজা করা হয়। এ তিথিকে শিব চতুর্দশী তিথি বলা হয়। শিব সংহারের পর সৃষ্টি করেন। শিব একজন মহান শিক্ষক। শিক্ষক হিসেবে তিনি নাট্য ও নৃত্যের নির্দেশনা দিয়েছেন। নাট্য ও নৃত্যের পারদর্শিতার জন্য তাঁকে নটরাজ বলা হয়। চিকিৎসায় দক্ষতার জন্য তাঁকে বৈদ্যনাথ বলা হয়। তিনি গজাসুরকে বধ করে তার চর্মকে পরিধেয় করেছেন। দেবতা ও দৈত্যরা একত্র হয়ে যখন সমুদ্র মন্থন করেছিলেন, তখন প্রথমে বিষ ওঠে। এই বিষ তিনি চুমুক দিয়ে পান করে কণ্ঠে রেখে দেন এবং তাঁর কণ্ঠ নীল হয়ে যায়। তাই তাঁর এক নাম নীলকণ্ঠ। তিনি দক্ষের যজ্ঞ ধ্বংস করে দিয়েছিলেন। মহাভারতের কিরাত নামক অধিবাসীর বেশে তিনি অর্জুনের বীরত্ব পরীক্ষা করেছিলেন এবং অর্জুনকে অস্ত্র দিয়েছিলেন। শিবপুরাণসহ অনেক পুরাণে শিবের মাহাত্ম্য বর্ণনা করা আছে। ভক্তগণ পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে শিবের পূজা করেন। শিবের উপাসকদের শৈব বলা হয়। আর পুরাণানুসারে গৌরী হলেন হিমালয় দুহিতা। তিনি কৃষ্ণবর্ণ নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তখন তাঁর নাম হয়েছিল কালী। পরে তপস্যার দ্বারা গৌরবর্ণ লাভ করায় তাঁর নাম হয় গৌরী। দেবী পুরাণানুসারে তিনি সূর্য-চন্দ্রের জ্যোতি নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন বলে তিনি গৌরী নামে প্রসিদ্ধ। তিনি পূর্ণ সূর্য-চন্দ্রের বর্ণাভার ন্যায় দেদীপ্যমান। চণ্ডীর উপাখ্যানে তিনি মহিষাসুরমর্দিনী চণ্ডী বা গৌরী। দুর্গার ধ্যানমন্ত্রে দেবী তপ্তকাঞ্চন বর্ণা অথবা অতসী পুষ্পের ন্যায় বর্ণাভা। দেবতাদের তেজে তাঁর দেহ গঠিত বলে তিনি গৌরী বা গৌরাঙ্গী বলেও পরিচিতা। দেবীর গাত্রবর্ণেই তাঁর স্বরূপ প্রকাশিত। দেবী গৌরীর দুই হাতবিশিষ্ট, চাঁর হাত বিশিষ্ট, দশ হাত বিশিষ্ট রূপ দেখা যায়। দুই হাত বিশিষ্ট রূপে একটি হাতে অভয়মুদ্রা ও অপর হাতে বরমুদ্রা বজায় থাকে। দ্বিতীয় রূপটিতে জপমালা, পদ্ম, কমণ্ডলু ও চতুর্থ হাতে অভয়মুদ্রা বিন্যস্ত থাকে। কোনো নিদর্শনে তাঁর দুপাশে গণেশ, কার্তিক, সরস্বতী ও লক্ষ্মী উপস্থিত থাকেন। কোনো নিদর্শনে তাঁর মাথার পেছনে একটি বাঁকা চাঁদ এবং পাদপটে গোধা, সিংহ প্রভৃতি দেখা যায়। কিন্তু পূর্ব ভারতে হরিণ, পূর্ণঘট ইত্যাদিও থাকে। নালন্দায় পাওয়া একটি নিদর্শনে (ইন্ডিয়ান মিউজিয়ামের সংগ্রহ) তাঁর বাঁ হাতে কলম ও ডান হাতে ত্রিশূল পাওয়া গেছে। আবার মুন্সিগঞ্জের সোনা রং এ পাওয়া একটি মিশ্র ধাতুর নিদর্শনে তাঁর আয়ুধ ছিল জপমালা, ত্রিশূল, কমণ্ডলু এবং বাহন ছিল মকর। তাঁর অন্যান্য রূপগুলোর নাম শ্রী, রম্ভা, ত্রিপুরা। ব্রহ্মা নিজের শরীর হতে গৌরীকে সৃষ্টি করে রুদ্র তপস্যার জন্য জলে নিমগ্ন হলে ব্রহ্মা গৌরীকে নিজের দেহে বিলীন করেন এবং গৌরীকে দক্ষের হাতে প্রদান করেন । এদিকে রুদ্র দীর্ঘকাল তপস্যা করে জল থেকে উত্থিত হয়ে পৃথিবীর সুশোভন অবস্থা ও মানুষের পরিপূর্ণতা দেখে ক্রুদ্ধ হয়ে চিৎকার করতে থাকেন। ফলে তাঁর কর্ণ হতে ভূত, প্রেত, বেতাল ইত্যাদি সৃষ্টি হয়ে দক্ষযজ্ঞ নষ্ট করে এবং দেবতাদের প্রতি অত্যাচার করতে থাকে। তখন বিষ্ণু নিজেই রুদ্রের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হন । কিন্তু ব্রহ্মা উভয়ের মধ্যে বিবাদের মীমাংসা করে দেন এবং গৌরীকে রুদ্রের হাতে প্রদান করতে দক্ষকে আদেশ দেন। ব্রহ্মা

কৈলাশ পর্বতে রুদ্রের বাসস্থান নির্দেশ করেন। এদিকে রুদ্রের দ্বারা দক্ষযজ্ঞ ও সুধা বিনষ্ট হওয়ায় গৌরী অত্যন্ত দুঃখিত হয়ে হিমালয়ে কঠোর তপস্যায় রত হন । এর ফলে তাঁর দেহ ভস্মীভূত হয়। তখন গৌরী হিমালয়ের গৃহে জন্মগ্রহণ করে উমা নামে পরিচিতা হন এবং মহাদেবকেই পতিরূপে পাবার জন্য কঠোর তপস্যা করতে থাকেন। তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে মহাদেব বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বেশে উমার কাছে উপস্থিত হয়ে খাদ্য ভিক্ষা করেন। উমা বৃদ্ধকে স্নান করে আহার গ্রহণ করতে বলেন। গঙ্গায় স্নান করতে গেলে এক মকর বৃদ্ধকে আক্রমণ করে। তখন বৃদ্ধ উমার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করলে উমা অগ্রসর হয়ে দেখেন যে , স্বয়ং মহাদেব তাঁর হস্তধারণ করেছেন। পিতা হিমালয় এই বিবরণ জ্ঞাত হয়ে উমাকে মহাদেবের হাতে সমর্পণ করেন। বামনপুরাণেও গৌরী সম্পর্কে বর্ণিত আছে। এখানে পার্বতীর অন্য নাম গৌরী। হিরণ্যাক্ষের পুত্র অন্ধক মন্দর পাহাড়ে ভ্রমণকালে মহাদেবের স্ত্রী গৌরীকে দেখে মোহিত হন। তাঁকে গ্রহণ করতে চেষ্টা করলে প্রহ্লাদ অন্ধককে ঐ কার্যে অগ্রসর হতে বিশেষরূপে নিষেধ করেন, কিন্তু অন্ধক সে কথায় কর্ণপাত করেন না। ফলে গৌরী শতরূপা হয়ে অন্ধককে নির্যাতন করেন। গৌরী শক্তিদায়িনী, শক্তির দেবী রূপে ভক্তদের দ্বারা পূজিত।

চিত্র: হরগৌরী (উৎস : জাদুঘর ৩২ : ৩৮১)

গণেশ

গণেশ গণশক্তির অধিদেবতা। ময়নামতি জাদুঘরে সংরক্ষিত বর্ণনানুসারে−

> কালো পাথরে তৈরী গণেশ মূর্তিটির আকার ১৫০ সেমি:x৯৯সেমি:। তিনি আধ্যাত্মিক ও বিপদ অপসারণকারী দেবতা। তাঁর চারটি হাত আছে। উপরের বাম হাতে মিষ্টির পাত্র ধারণ করে আছেন . মূর্তিটি পদ্মাসনে নাচের ভঙ্গিতে দাঁড়ানো। পদ্মাসনের নিচে এঁর বাহন ইঁদুর। পাদপীঠের উপর তিন লাইন প্রাচীন বাংলা উৎকীর্ণ রয়েছে যা থেকে জানা যায় যে, গোপাল দেবের রাজত্বের প্রথম বছর জম্ভলমিত্র নামে এক বৃদ্ধ তাঁর পিতা-মাতাসহ সমস্ত সৃষ্টির উদ্দেশে মূর্তিটি উৎসর্গ করেছেন . এর নির্মাণশৈলী খোদিত প্রাচীন হাতের লেখার ধরনানুসারে মূর্তিটি খ্রিষ্টীয় ১০ম শতকের তৈরী বলা যায়। উল্লেখ্য যে, গণেশ হিন্দুধর্মের জনপ্রিয় দেবতা সত্ত্বেও জৈন এবং বৌদ্ধ মতাবলম্বীদের নিকট পূজা লাভ করে থাকেন। মূর্তিটি কুমিল্লা জেলার চান্দিনা থানার মন্দুক গ্রাম থেকে সংগৃহীত।[১২]

মহাভারতে ব্যাসদেবের কলমধারী হিসেবে সর্বপ্রথম গণেশের উল্লেখ রয়েছে। *বিষ্ণুধর্মোত্তরপুরাণ*, *মৎসপুরাণ*, *অগ্নিপুরাণ*, *তান্ত্রিকসূত্র* প্রভৃতিতে তাঁর চব্বিশটি রূপের বিবরণ পাওয়া যায়। সংখ্যাতীত

বিচিত্ররূপী রুদ্রগণের যিনি অধিপতি তিনিই গণেশ বা গণেশ্বর। কিন্তু মহাভারতে গণেশ্বর তেত্রিশ সংখ্যক। *ঋগ্বেদে* বৃহস্পতি ও ব্রহ্মণস্পতিকেই গণপতি বলা হয়। তিনি ব্রহ্মণস্পতি স্তুতিকারক পুরোহিত। তিনি তীক্ষ্ণশৃঙ্গ। 'গণানাং ত্বা গণপতি হবামহে' – *ঋগ্বেদ*-এর এই মন্ত্রে ব্রহ্মণস্পতিকেই গণপতি বলা হয়েছে। দেবগণের মধ্যে ইনি গণপতি। তিনি কবিগণের ভিতর কবি, জ্ঞানিগণের মধ্যে জ্ঞানি, কীর্তিমানের ভিতর রাজা, মন্ত্রসমূহের স্বামী। ইনি দেবতাদের আদিতে বিরাজমান, সকলপূজার প্রারম্ভে তাঁর নাম উচ্চারণ করা হয়; তাই বিদ্বানগণ তাঁকে শ্রেষ্ঠ বলে থাকেন। গণেশই ওঁকাররূপী ভগবান। বিনায়ক, বিঘ্ননাশক, লম্বমুণ্ড, গণপতি, গজানন, হেরম্ব, বিঘ্নাত্মক, গণাধিপতি, একদণ্ড ইত্যাদি নাম বিভিন্ন সূত্রে পাওয়া যায়। পৌরাণিক কাহিনি অনুযায়ী উমা বা পার্বতী বা সম্বিকা বা চণ্ডীর দেহ থেকে জন্ম নিয়েছিলেন। যদিও জন্মের ক্ষেত্রে শিবকে জনকের ভূমিকা পালন করতে হয়নি। গণেশের জন্ম বিষয়ে *ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ*, *বামনপুরাণ*, *বরাহপুরাণ*, *স্কন্দপুরাণ* প্রভৃতিতে ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করে। *ব্রহ্মবৈবর্ত* পুরাণানুসারে গণেশের জন্ম বিষ্ণুর বরে এবং বিষ্ণুর রূপের যে সাধারণ বৈশিষ্ট্য গণেশর রূপে পাওয়া। গণেশ খর্বকার, নাদুসনুদুস শরীর, হাতির মতো মাথা, আর্ধবৃত্তাকার উত্তল পেট, সাপের কোমর বন্ধ প্রভৃতি। তাঁর বাহন ইঁদুর। নৃত্যরত অবস্থায় গণেশের ছয় বা আট হাতও দেখা যায়। পঞ্চোপাসকদের মধ্যে যাদের ইষ্টদেবতা গণেশ তারা গাণপত্য নামে পরিচিত। ভারতে মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক, গুজরাট প্রভৃতি অঞ্চলে প্রতিবছর মহাধুমধামে গণেশের পূজা হয়ে থাকে। মূর্তিটি জাদুঘর ভবনের বাইরে প্রবেশ পথের পাশে প্রদর্শিত হচ্ছে।

চিত্র: **গণেশ** (উৎস : জাদুঘর ৩৬ : ৭৬৭)

সূর্য

সূর্য ঋগ্বেদের অন্যতম প্রধান দেবতা। ময়নামতি জাদুঘরে সংরক্ষিত বর্ণনানুসারে–

> কালো পাথরে তৈরী ত্রি-বিক্রম সূর্য মূর্তিটির পরিমাপ ১৩৫ সেমি:X৬৪সেমি:। হিন্দুধর্মাবলম্বীদের নিকট তিনি রোগ নিরাময়কারী দেবতা হিসাবে স্বীকৃত। তাঁর দুহাতে ডাঁটাসহ পদ্মধরে সপ্তরথ পাদপিঠের উপর সমভঙ্গ ভঙ্গিতে দাঁড়ানো। মাথার চারিদিকে অলৌকিক দীপ্তি ও বুকে উপবীত বিদ্যমান। তাঁর বাম পাশে কোষবিদ্ধ অবস্থায় তরবারি উৎকীর্ণ। দু'পায়ে উঁচু জুতা পরিহিত।

দেবতার দু'পাশে সংগা ও ছায়া নামে দু'স্ত্রী দাঁড়ানো ছাড়াও দণ্ডি ও পিঙ্গল নামে দু'জন অনুচর পর্যায়ক্রমে দাঁড়ানো। সারথী অরুণ ঘোড়াসহ রথ পরিচালনা করছে। পট্টঠেসের কৌণিক চূড়ার নিচে কীর্তিমুখ রয়েছে। মূর্তিটি খ্রিষ্টীয় আনুমানিক ১১-১২ শতকের তৈরী। মূর্তিটি কুমিল্লা জেলার মুরাদনগর থানার বাবুটিপাড়া গ্রাম থেকে সংগৃহীত। (জাদুঘর ১৭ : ৭৭২)

গুণ-কর্ম-অবস্থাভেদে এক সূর্যই আদিত্য, বরুণ, বিষ্ণু, পূষা, অর্যমা, মাতরিশ্বা, উষা, ভগ, মিত্র, তৃষ্টা প্রভৃতি বিচিত্র নামে অভিহিত হয়েছেন। তেজ বা প্রাণ শক্তিস্বরূপ সূর্য সমস্ত বিশ্ব চরাচরের আত্মা রূপে ঋগ্বেদে স্তুত হয়েছেন। কৃষ্ণযজুর্বেদে বলা হয়েছে – 'অসৌ বা আদিত্যঃ প্রাণঃ প্রাণমে বৈনানুৎসৃজতি' অর্থাৎ আদিত্যই বিশ্বের প্রাণ স্বরূপ এবং আদিত্য থেকেই প্রাণের সৃষ্টি। শুক্লযজুর্বেদে সূর্যকে মিত্র ও বরুণের চক্ষুস্বরূপ বলা হয়েছে। সূর্যই ব্রহ্মাস্বরূপ, ক্ষয়বাহিত, জ্যোতি প্রকাশক। সূর্য দেবতাদের অগ্রজ। সূর্যের অপর নাম সবিতা। সবিতা শব্দের অর্থ – প্রসবিতা। সবিতা বৈ দেবানাং প্রসবিতা। অর্থাৎ সবিতা দেবতাদের প্রেরণকর্তা। সূর্য পৃথিবী, অন্তরীক্ষ ও দ্যুলোক তিন লোকেই অবস্থান করে। সূর্য সর্বদা গতিমান ও দ্যুতিমান। সূর্যের এক চক্ররথে যে সপ্ত অশ্ব যোজিত আছে, এই অশ্বই সপ্ত নামে সূর্যের রথ সর্বদা বহন করে। সূর্যের রথের সারথির নাম অরুণ। প্রভাত সূর্যকে অরুণ বলা হয়। সূর্য সর্বরোগহর্তা। বরাহমিহিরের *বৃহৎসংহিতায়* তাঁর রূপ বর্ণিত হয়েছে। মথুরাতে সূর্যের প্রথম মূর্তি তৈরি হয়েছিল বলে ধারণা করা হয়। সূর্যের সাধারণ বৈশিষ্ট্যের মধ্যে এক মাথা বিশিষ্ট, উঁচু দুটি হাতে পদ্ম ধরে কাঁধ পর্যন্ত প্রসারিত, ঘোড়াটানা রথের উপর সমপদস্থানক আরোহণরত, পায়ে হাঁটুর নিচ পর্যন্ত উঁচু বুটজুতো এবং গায়ে রাজকীয় পোশাক। গুপ্তপূর্ব যুগের নিদর্শনগুলোতে তার গায়ে থাকত কাঁধ থেকে জানু পর্যন্ত ঝুলে থাকা কুর্তা। কিন্তু গুপ্ত আমল থেকে তাঁর বেশভূষার প্রকৃতির পরিবর্তন হতে থাকে। গুপ্ত আমলে বুকে আড়াআড়িভাবে বেল্টসহ কোমরে ছোড়া বা তলোয়ার ঝুলে থাকতে দেখা যায়। তাঁর পায়ের দু'পাশে থাকে ভূদেবী মহাশ্বেতা বা পৃথিবী, ছায়া, সঙ্গা, নিক্ষুভা প্রভৃতি নামের স্ত্রী মূর্তি। এছাড়া বিভিন্ন যুগে সূর্যমূর্তি বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করেছে। খ্রি.১২ শতক পর্যন্ত প্রচুর সূর্য মূর্তি ও মন্দির তৈরির দৃষ্টান্ত রয়েছে। সেসময় বিপুল সংখ্যক উপাসকও ছিল। তাঁর উপাসকদের বলা হয় সৌর। কিন্তু সম্প্রতি সূর্যপূজা ব্যাপকভাবে প্রচলিত নেই।

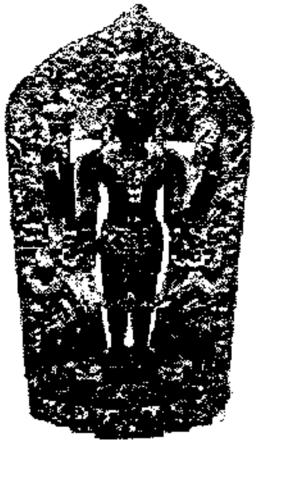

চিত্র: সূর্য (উৎস : জাদুঘর ১৭ : ৭৭২)

ত্রিবিক্রম বিষ্ণু

ঋগ্বেদে ও পুরাণে বিষ্ণু অন্যতম প্রধান দেবতা। *ঋগ্বেদে* ১০৫ বার, *সামবেদে* ২৪ বার, *যজুর্বেদে* ৫৯ বার ও *অথর্ববেদে* ৬৬ বার বিষ্ণুর উল্লেখ আছে। ময়নামতি জাদুঘরে সংরক্ষিত বর্ণনানুসারে–

> কালো পাথরে তৈরি ত্রি-বিক্রম বিষ্ণু মূর্তিটির আকার ১২২ সেমি:x৫৮সেমি। তাঁর চার হাতে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম ধারণ করে আছেন। সঙ্গে তাঁর দুই স্ত্রী সরস্বতী ও লক্ষ্মী। সরস্বতী বিদ্যার দেবী। বিষ্ণুর বাম পাশে দাঁড়ানো। লক্ষ্মী সৌন্দর্য ও সম্পদের দেবী। বিষ্ণুর ডান পাশে দাঁড়ানো পদ্মাসনের নিচের অংশে বিষ্ণুর বাহন গরুড় নতজানু অবস্থায় অঞ্জলি ভঙ্গিতে উপবিষ্ট। হিন্দুধর্মাবলম্বীদের নিকট বিষ্ণু ত্রাণকারী হিসাবে সমাদৃত। পট্টঠেসের কৌণিক চূড়ার নিচে কীর্তিমুখ আছে। মূর্তিটি খ্রিষ্টীয় আনুমানিক ১১-১২ শতকের তৈরী। (জাদুঘর ৩৬ : ৩৭৮)

খ্রিস্টীয় ৪১৫-৪৫ অব্দে প্রথম কুমারগুপ্ত মহেন্দ্রাদিত্যের গদওয়া লিপিতে ভগবদ নামে বিষ্ণুর উল্লেখ পাওয়া যায়। তারপর খ্রি. ৪৫৫-৫৮ অব্দে স্কন্ধগুপ্তের জুনাগড় লিপিতে বিষ্ণু নামে ব্যাপক পরিচিতি পাওয়া যায়। আবার খ্রি. ৪৮৪ এরানলিপিতে তাঁর পরিচিতি দেয়া হয়েছে জনার্দন নামে। সুতরাং বোঝা যায় তিনি যুগে যুগে বিভিন্ন নামে পরিচিত হয়েছেন। তাই অনেক পণ্ডিত মনে করেন তিনি ঋক্ বেদে বর্ণিত আদিত্যেরই পরবর্তী সংস্করণ। তাঁর কয়েকটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য রয়েছে। তিনি মূলত একমুখ ও চার হাতবিশিষ্ট দেবতা। তাঁর পরিধানে থাকে ধুতি, মাথায় মুকুট ও গলায় বনমালা। তাঁর বাহন গরুড়। *বৃহৎসংহিতার* বর্ণনা অনুযায়ী তাঁর বুকে থাকবে শ্রীবৎস ও কৌস্তুভমণি। উত্তরভারতীয় নিদর্শনগুলোতে তাঁর সহচরী পদ্মধারিণী শ্রী ও বীণাধারিণী পুষ্টি। অপরদিকে দক্ষিণ ভারতীয় নিদর্শনগুলোতে শ্রী ও ভূমি এবং পূর্বভারতে বসুমতি ও পৃথিবী দেখা যায়। কাশ্মীর ও নেপালে চারমাথাবিশিষ্ট বিষ্ণুর নিদর্শন আছে। আবার নেপালে দু'হাতবিশিষ্ট বিষ্ণুর অস্তিত্ব আছে। ত্রিদেব তত্ত্বে তাঁর স্থান দ্বিতীয়। ঋগ্‌বেদের বিভিন্ন সূক্তে বিষ্ণুর যে গুণ ও ক্রিয়ার বিবরণ পাই তন্মধ্যে সর্বপ্রধান তাঁর তিন পদক্ষেপে বিশ্বভুবন পরিক্রমণ করা। তিনি বিশ্ব ভুবন স্থির করেছেন, নির্মাণ করেছেন অথবা ত্রিলোক ধারণ করেছেন। তিনি এই জগৎ পরিক্রমণ করেছেন। তাঁর তিন প্রকার পদবিক্ষেপে জগৎ আবৃত হয়েছে। ভক্তদের নিকট তিনি অতি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছেন।

চিত্রঃ ত্রিবিক্রম বিষ্ণু (উৎস : জাদুঘর ৩৬ : ৩৭৮)

হেরুক

হেরুক হিন্দু ও বৌদ্ধ দুই ধর্মাবলম্বীদের দেবতা হিসেবে স্বীকৃত। ময়নামতি জাদুঘরে সংরক্ষিত বর্ণনানুসারে–

> হেরুক কালো পাথরের তৈরী। মূর্তিটির পরিমাপ ১০২ সেমি:x৬১সেমি:। বজ্রয়ান বৌদ্ধ মতাবলম্বীদের দ্বারা উদ্ভূত এই দেবতা অমঙ্গল বিনাশকারী হিসাবে গণ্য হন : তিনি বাম পায়ের উপর নাচের ভঙ্গিতে দাঁড়ানো। ডান পা বাম পায়ের উরুর উপর স্থাপিত। বাইশ জন মানুষের মাথার খুলির সমন্বয়ে তৈরি মালা পরিধান করে আছেন : তাঁর রক্তরাঙা চোখের হিংস্র চাহনী এবং বিদারিত দাঁত তাঁকে অত্যন্ত ভয়ঙ্করদর্শী করে তুলেছে। দুটি হাতের মধ্যে দক্ষিণ হাত ভাঙ্গা, বাম হাতে মাদকদ্রব্যসহ মানুষের মাথার খুলি ধারণ করে আছেন। বাম কাঁধের উপর খত্তভংগ বহন করছেন যা দেখতে অনেকটা যজ্ঞোপবীতের ন্যায়। তাঁর মাথার মুকুট পাঁচ জন মানুষের মাথার খুলি দ্বারা অলঙ্কৃত এবং চুলগুলি মুকুট আকারে উপরের দিকে বিন্যস্ত। মুকুটের মধ্যে অক্ষোভ্য লোকোত্তর বুদ্ধের প্রতিকৃতি বিদ্যমান। দেবতাকে ঘিরে ছয়টি তারা মূর্তি রয়েছে : মূর্তিটি আনুমানিক খ্রিষ্টীয় ৯ম-১০ম শতকের তৈরী। মূর্তিটি কুমিল্লা জেলার কচুয়া থানার লাজাইর গ্রাম থেকে সংগৃহীত। (জাদুঘর ৩৬ : ৭৬৫)

কালিকাপুরাণে হেরুক শিবের অনুচর। এতে হেরুকের যে বর্ণনা আছে, তাতে তাঁকে ভয়ংকর কাপালিক রূপে প্রতীত হয়। হেরুক শ্মশানবাসী, রক্তবর্ণ, ভয়ংকর, তরবারি ও ঢাল ধারণকারী, রুদ্রপুত্র, নরমাংসভোজী, শোণিতস্রাবী, তিনটি নরমুণ্ডমালাশোভিত, অগ্নিদগ্ধ গলিত দণ্ড, প্রেতের উপরে সমাসীন, শস্ত্র ও বাহন যাঁর ভূষণ তাকে ধ্যান ও পূজা করছে। হেরুককে বৌদ্ধতন্ত্রের দেবতা মনে করা হয়। হিন্দু তন্ত্রে ইনি শিবের রূপভেদ। বৌদ্ধ বজ্রযানে হেরুক ভীষণ ভয়াল। নীলবর্ণ, নরচর্ম পরিহিত, নরকপালের মালা ও অক্ষোভ্য অলংকৃত মস্তক। উর্ধ্বে প্রজ্বলিত পিঙ্গলকেশ, রক্তবর্ণ, গোলাকার চক্ষু, অন্ত্র দিয়ে গাঁথা মুণ্ডমালা লম্বমান, নরের অস্থি দিয়ে নির্মিত অলংকার, দুইবাহু, একমুখ, ভয়ংকর দন্তসমন্বিত মুখমণ্ডল। ডান হাতে বজ্রধারণকারী, বাঁহাতে রক্তপূর্ণ নরকপাল, বামস্কন্দে লগ্ন বাদ্যরত ঘণ্টা পতাকা নরমুণ্ড ও বিশ্ববজ্র অলংকৃত পঞ্চসূচি। নিম্নে বজ্রশিখর একসূচী বজ্রাকার যজ্ঞোপবীত তুল্য খট্টাঙ্গধারী, বিশ্বপদ্মসূর্যে বামপাদ স্থাপিত। ঐ পায়েরই উরুতে ডান পা রেখে নৃত্যশীল। এই বিবরণ মূলত তাণ্ডবনৃত্যরত নটরাজ শিবেরই মত। তাই বলা হয় হেরুক শিবেরই একজন অনুচর, শিবেরই রূপভেদ, অপরদিকে ধ্বংসের দেবতা রুদ্রের সমতুল্য।

চিত্র: হেরুক (উৎস : জাদুঘর ৩৬ : ৭৬৫)

মারীচী

মারীচী হিন্দুধর্ম গ্রন্থ *রামায়ণ*-এর একটি চরিত্র। অপরদিকে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের দেবতা হিসেবেও স্বীকৃত। মারীচী মূর্তিটি ১৯৮৭ সালে কুমিল্লা সেনানিবাস থেকে প্রাপ্ত। বর্ণনানুসারে– 'মূর্তিটি কালো পাথর ছেঁটে গড়া। এ নিদর্শনে মারীচী সাতটি শূকর বাহিত রথে প্রত্যালীঢ় ভঙ্গিতে দাঁড়ানো। তাঁর তিনটি মুখ। একটি মুখ শূকরীর মতো ও আটটি হাত আছে। মূর্তিটির পরিমাপ ৬৩ সেমি : x ৩৯ সেমি:। সময়পর্ব খ্রিষ্টীয় আনুমানিক ১০ম-১১দশ শতক (জাদুঘর ২৫ : ২৯৯৭)।' মারীচী এক দিকে বৌদ্ধ মহাযানীদের সৌভাগ্যের দেবতা হিসেবে পূজিত হতো, অপরদিকে *রামায়ণে* মারীচী হিরণ্যকশিপু বংশে সুন্দ অসুরের ঔরসে ও তাড়কা রাক্ষসীর গর্ভেজাত। মারীচী রাবণের আজ্ঞাবহ অনুচর ছিলেন। বিশ্বামিত্র যজ্ঞ আরম্ভ করলে তাতে নানা প্রকার বিঘ্ন উৎপাদন করেছিল। তখন দশরথ এই রাক্ষসকে বিনাশ করবার জন্য বিশ্বামিত্রসহ রামকে বনে পাঠিয়ে দেন। বিশ্বমিত্রের যজ্ঞে মারীচী ভীষণ বিঘ্ন সৃষ্টি করে। তখন রাম মানবাস্ত্রের মাধ্যমে মারীচীকে অনেক দূরে নিক্ষেপ করেন। পরে দণ্ডকারণ্যে রাম, সীতা ও লক্ষ্মণকে দেখে পূর্ব ঘটনা স্মরণ করে মারীচী প্রতিশোধের ইচ্ছায় তীক্ষ্ণশৃঙ্গী মৃগরূপে তাঁদের আক্রমণ করে। রাম তিনটি বাণ নিক্ষেপ করলে দুই রাক্ষস নিহত হলেও মারীচী কোনো মতে প্রাণরক্ষা করে। সেই থেকে মারীচী তপস্বীবেশে আশ্রম নির্মাণ করে বাস করতে থাকে। রাবণ সীতাকে হরণ করতে আসলে মায়াবী মারীচীর সাহায্যপ্রার্থী হয়ে তাকে স্বর্ণমৃগের রূপ ধারণ করে সীতাকে প্রলুব্ধ করতে বলেন। মারীচী রামের বিক্রম জেনে অসম্মতি প্রকাশ করে। রাবণ তাকে অর্ধরাজ্যের লোভ দেখান অন্যথায় হত্যা করার ভয় দেখান। মারীচী অবশেষে স্বর্ণমৃগের রূপ ধরে সীতার সম্মুখে উপস্থিত হয়। সীতার অনুরোধে রাম তাকে ধরতে গেলে মারীচী রামকে মায়া বলে বহুদূর নিয়ে যায়। অবশেষে তাকে ধরতে অসমর্থ হয়ে রাম শরাঘাতে তাকে হত্যা করেন।

চিত্র: **মারীচী** (উৎস : জাদুঘর ২৫ : ২৯৯৭)

নন্দী

নন্দী শিবের প্রধান ও বিশ্বস্ত অনুচর। পিতার নাম শিলাদ। তাঁর অন্য নাম নন্দিকেশ্বর। মহর্ষি শিলাদ মহাদেবের বরে নন্দী নামে অযোনিসম্ভব পুত্র লাভ করেন। ধার্মিক পিতা নন্দীর জন্মের পর কুষ্ঠি গণনা করে জানতে পারেন ইনি হবেন শিব অন্তপ্রাণ। বাস্তবেও তাই ঘটে। ময়নামতি জাদুঘরে সংরক্ষিত বর্ণনানুসারে–'নন্দী কালো পাথরের তৈরি। মূর্তিটির পরিমাপ ১৪ সেমি:x১৮সেমি:। এটি শিবের বাহন। মূর্তিটি খ্রিষ্টীয় আনুমানিক ১১দশ-১২দশ শতকের রীতি বৈশিষ্ট্য বহন করছে (জাদুঘর ২৭ : ৩৮৩)।' এখানে তিনি ষাড়ের আকৃতি বিশিষ্ট হলেও তাঁকে দেবতা জ্ঞানে পূজা করা হয়েছে। নন্দীর বর্ণনা *রামায়ণ* এবং *পুরাণে* উভয় স্থানেই রয়েছে। *রামায়ণ* অনুসারে এর দেহ - বামনাকৃতি, রূপ - করাল, বর্ণ - কৃষ্ণ পিঙ্গল, মুখমণ্ডল – ষাড়ের আকৃতি। রাবণ কুবেরকে পরাজিত করে পুষ্পিকা আরোহণে কৈলাসে যাচ্ছিলেন। এমন সময় তাঁর রথের গতি থেমে যায়। এই সময় নন্দী তাঁকে বনমধ্যে যেতে নিষেধ করেন। কেননা হর-গৌরী তখন ওখানে বিহার করছেন। রাবণ নন্দীর মুখ দেখে হেসে উঠলেন। নন্দী তখন ক্রুদ্ধ হয়ে অভিশাপ দিলেন, আমার আকৃতি বিশিষ্ট বানরগণই তোমাকে সবংশে নিধন করবে। নন্দীর এই অভিশাপের ফলেই একদিন রাবণ বংশ ধ্বংস হলো। কূর্মপুরাণেও নন্দী মহাদেবের প্রধান অনুচর ও গণনায়ক। ইনি করালদর্শন, বামন, বিকটাকার, মুণ্ডিতমস্তক, ক্ষুদ্রবাহু, মহাবল। বাল্যকাল থেকেই নন্দী দীর্ঘকাল মহাদেবের অর্চনা করে তাঁর গণমধ্যে গণ্য হন। মহাদেব নিজে নন্দীর বিবাহ দেন।

চিত্র: নন্দী (উৎস : জাদুঘর ২৭ : ৩৮৩)

মহিষমর্দিনী

মার্কেণ্ডেয় পুরাণ-এর দুর্গা সপ্তশতী ও চণ্ডী অধ্যায়ে মহিষমর্দিনীর বর্ণনা আছে। তবে তিনি দশভুজা, কাত্যায়নী, দুর্গা, ভদ্রকালী নামেও পরিচিতা। ময়নামতি জাদুঘরে সংরক্ষিত বর্ণনানুসারে–

> এই দেবী মহিষ ও সিংহের উপর প্রত্যালীঢ় ভঙ্গিতে দাঁড়ানো। তিনি কখনও কখনও অষ্টভুজা দশভুজা হয়ে থাকেন. বর্তমান নিদর্শনটিতে দশটি হাত আছে। তাঁর হাতগুলোতে দক্ষিণাবর্তে ত্রিশূল, পাশ, খড়্গ, সূচী, খেটক, ধনু, কুঠার ও চাবুক এবং নিচের বাম হাতে অসুরের চুল ধরা আছে। মূর্তিটির পরিমাপ ৫৮ সেমি:x২৩ সেমি:। মূর্তিটি কালো পাথর ছেঁটে গড়া। এ মূর্তিটি খ্রিস্টীয় দ্বাদশ শতকের রীতিবৈশিষ্ট্য বহন করছে। (জাদুঘর ২৮ : ৩৮৭)

তাঁর একটি মাথাসহ দুটি থেকে বত্রিশটি হাত থাকতে পারে। তবে দশ হাতবিশিষ্ট মূর্তির সংখ্যাই বেশি। আর বত্রিশ হাতবিশিষ্ট কেবল একটি নিদর্শন দিনাজপুর জেলায় আবিষ্কৃত হয়েছে। তাঁর প্রতিটি হাত বিবিধ অস্ত্রশস্ত্র দ্বারা সজ্জিত। অস্ত্রশস্ত্রের মধ্যে একটি হল ত্রিশূল যা তার পায়ের কাছে পড়ে থাকা মহিষাসুরের বুকে বিদ্ধ থাকে। মহিষাসুরকে একটি মহিষের দেহ থেকে অধবহির্গত অবস্থায় যুদ্ধরত দেখা যায়। দেবীর বাহন সিংহ। সিংহ মহিষাসুরকে কামড়ে ধরে থাকে। ভারতের উদয়গিরি পাহাড়ের একটি গুহায় পাওয়া বারো হাতবিশিষ্টি নিদর্শনটি সবচেয়ে প্রাচীন। এটি পাওয়া যায় খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতকে। একটি নিদর্শনে তাঁর কোলে একটি শিশুও দেখা যায়। ভবিষ্যপুরাণে মহিষমর্দিনীর অপর একটি বিন্যাসে পূজার উল্লেখ আছে। এছাড়া মহিষমর্দিনীর নয়টি রূপের উল্লেখ পাওয়া যায়। রূপগুলোর নাম হলো উগ্রচণ্ডা, রুদ্রচণ্ডা, প্রচণ্ডা, চণ্ডোগ্রা, চণ্ডা, চণ্ডনায়িকা, চণ্ডাবতী, বহুরূপা ও অতিচণ্ডিকা। এদের মধ্যে উগ্রচণ্ডা সবার মাঝে অবস্থান করেন। এ যাবৎ কালে নওগাঁ জেলার পোরশা থেকে এ ধরনের একটি নিদর্শন আবিষ্কারের সন্ধান পাওয়া গেছে। বাংলাদেশের প্রায় সব এলাকা থেকেই প্রচুর মহিষমার্দিনী মূর্তির সন্ধান পাওয়া গেছে।

মহিষমর্দিনী দেবী দুর্গা মহিষাসুর দৈত্যকে বিনাশ করেছিলেন বলে মহিষমর্দিনী নামে খ্যাত হন। মহিষাসুরের অত্যাচারে অত্যন্ত সন্ত্রস্ত হয়ে দেবতারা বিষ্ণুর শরণাপন্ন হলে বিষ্ণু বললেন– ব্রহ্মার বরে মহিষাসুর পুরুষজাতীয় জীবের হস্তে অবধ্য। তবে দেবতাদের তেজ হতে যদি এক পরমরূপবতী নারী সৃষ্টি হয়, তবেই মহিষাসুর বধ করতে সমর্থ হবেন। দেবতাদের মিলিত প্রার্থনায় এক অপূর্ব লাবণ্যময়ী অষ্টাদশ-হস্তা নারী সৃষ্টি হলো। বিভিন্ন দেবতার তেজ হতে তাঁর বিভিন্ন অঙ্গ সৃষ্টি হলো। মহাদেব ত্রিশূল, বরুণ, অগ্নি শীতঘ্নীশক্তি পবন তূণীর ও ধন, ইন্দ্র বজ্র, যম দণ্ড, ব্রহ্মা কমণ্ডলু ও দেবতারা অন্যান্য অস্ত্র তাঁকে দান করলেন। মহিষাসুর এই মহাশক্তি-সম্পন্না নারীর সংবাদ পেয়ে তঁকে তার সম্মুখে আনবার জন্যে দূত প্রেরণ করে অকৃতকার্য হলো। সেনাপতিদের পাঠানো হলো। তারা দেবীর হস্তে নিহত হলে মহিষাসুর নিজেই দেবীর কাছে গেল। তখন দুই জনের মধ্যে ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হয়। কিছুদিন যুদ্ধের পর দেবী চক্র দ্বারা মহিষাসুরের মস্তক বিচ্ছিন্ন করে তাকে নিহত করলেন। সেই থেকে দুর্গা মহিষমর্দিনী নামে খ্যাত।

চিত্রঃ মহিষমর্দিনী (উৎস : জাদুঘর ২৮ : ৩৮৭)

মনসা

মনসা হিন্দুধর্মে দেবীরূপে বিশাল স্থান অধিকার করে আছে। পুরাণ অনুসারে বীণা অক্ষধারিণী ব্রহ্মাপত্নী সাবিত্রী ও সরস্বতীর প্রভাবে কল্পিতা মনসা দেবী। ময়নামতি জাদুঘরে সংরক্ষিত বর্ণনানুসারে–

> মনসা হিন্দুধর্মে সাপের দেবী হিসেবে গণ্য হন। আলোচ্য নিদর্শনটি কালো পাথর ছেঁটে গড়া। মূর্তিটির পরিমাপ ২৩ সেমিঃ x ১৫ সেমিঃ। দাঁড়িয়ে থাকা মনসার কটিদেশের নিচের অংশ এবং ডান হাত ভাঙা। তার মাথার উপর পাঁচটি সাপের ফনা আছে। মূর্তিটি আনুমানিক খ্রিস্টীয় নবম দশম শতকের রীতিবৈশিষ্ট্য বহন করছে। (জাদুঘর ২৮ : ৩৮২)

তবে বৈদিক সাহিত্যে বা প্রাচীনসূত্রে মনসার তেমন উল্লেখ নেই। ব্রহ্মবৈবর্ত্য পুরাণে নাগরাজা বাসুকির বোন হিসেবে প্রথম মনসা নামটির উল্লেখ পাওয়া যায়। বিভিন্ন সূত্রে তাঁর বিবিধ পরিচয় পাওয়া যায়, যেমন- জগৎগৌরী, শৈবী, বৈষ্ণবী, মাগেশ্বরী, সিদ্ধযোগিনী, পদ্মাবতী। *ব্রহ্মবৈবর্ত্যপুরাণে* তাঁর রূপের বর্ণনায় বলা হয়েছে-মনসা শ্বেতচম্পকের বর্ণ বিশিষ্টা, রত্নালংকার ভূষিতা, অগ্নিশুদ্ধবসন পরিহিতা, নাগযজ্ঞোপবীতধারিণী, মহাজ্ঞানযুক্তা, জ্ঞানীশ্রেষ্ঠা, সিদ্ধাধিষ্ঠাত্রী। পদ্মপুরাণে দেবীর রূপের বর্ণনায় বলা হয়েছে-মনসা সর্পকুলের জননী, চন্দ্রবদনা, সুন্দরকান্তিযুক্তা বদান্যতা গুণসম্পন্না, হংসোপরি উপবিষ্টা, রক্তবসন পরিহিতা, কাম্যদাত্রী, হাস্যমুখী, অষ্টনাগ সমন্বিতা কামরূপা সর্পিণী, নাগশ্রেষ্ঠগণের দ্বারা ভূষিতা। মনসা সর্পভয় দূর করেন, এজন্যই তিনি বিষহরী। মনসার সাধারণ বৈশিষ্ট্যে বলা হয়েছে একটি মুখ, দুটি অথবা চারটি হাত। দুহাত বিশিষ্ট মনসার বাম হাতে সাপ ও ডান হাতে ফল ধরা থাকে। এরকম একটি নিদর্শন খুলনা জেলার কাশিমনগর গ্রামে রয়েছে। আর চার হাত বিশিষ্ট রূপের ক্ষেত্রে থাকবে ডাল, সাপ, ফল ও উৎসঙ্গ শিশু। তাঁর মাথার উপর থাকবে সপ্তবাসুকি অথবা ত্রয়ীবাসুকি। তাঁর দেহের বামে থাকে ললিতাসন আর আসনে থাকে ঘট, ডানে যোগাপট্টাসনে কৃশকায় জরৎকাসুর এবং তাঁর কোলের উপর স্থিত পুত্র আস্তিকমুনি। তাঁর নিদর্শন পটে সিজ গাছ দেখা যায়। মনসা সর্পগণের দেবী। ইনি জরৎকারু মুনির স্ত্রী, আস্তিকের মাতা এবং বাসুকির ভগিনী। ব্রহ্মার উপদেশে কশ্যপ সর্পমন্ত্রের সৃষ্টি করে তপোবলে মনে মনে এঁকে মন্ত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে সৃষ্টি করেন ; সেই জন্য ইনি মনসা এবং এঁকে কশ্যপের মানস কন্যা বলা হয়। পুরাকালে মানুষেরা সর্বদা সর্পভয়ে থাকত ; কারণ, নাগরা যাকে দংশন করতো, তৎক্ষণাৎ তার মৃত্যু হতো। তখন ব্রহ্মার উপদেশে কশ্যপ মন্ত্র সৃষ্টি করে এই সকল মন্ত্রের অধিষ্ঠাত্রীরূপে মনসাকে সৃষ্টি করলেন। কুমারী অবস্থায় মনসা মহাদেবের কাছে যান এবং তাঁর কাছ থেকে স্তব, পূজা, মন্ত্র ইত্যাদি সবই শিক্ষা করে সিদ্ধ হন। পরে দেবতা, মনু, মুনি, নাগ, মানুষ সকলেই মনসাদেবীর পূজা করতে থাকেন। একদা স্বামী জরৎকারু মনসার উরুতে মাথা রেখে নিদ্রা যাচ্ছিলেন। সন্ধ্যাকালের উপস্থিতিতে সন্ধ্যা-বন্দনা না করায় স্বামীর ধর্মলোপ হবে- এই ভয়ে ভীত হয়ে মনসা স্বামীর নিদ্রাভঙ্গ করলেন। হঠাৎ তাঁর নিদ্রাভঙ্গ করায় মনসার উপর জরৎকারু অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন। পূর্বে প্রতিজ্ঞা অনুসারে জরৎকারু স্ত্রীকে পরিত্যাগ করলেন। মনসা তাঁর ইষ্টগুরু মহাদেব ও পিতা কশ্যপকে স্মরণ করলে তাঁরা জরৎকারুর সম্মুখে এলেন। স্ত্রীকে ত্যাগ করার কারণ শুনে এঁরা বললেন, স্ত্রীকে ত্যাগ করতে হলে স্বধর্ম পালনের জন্য পুত্রোৎপাদন করে ত্যাগ করাই উচিত। পুত্রোৎপাদন না করলে তপোভঙ্গ হয়। তখন জরৎকারু মনসার নাভি স্পর্শ করলেন। ফলে এই গর্ভে এক তেজস্বী ও তপস্বী পুত্রের জন্ম হলো। এরপর জরৎকারু তপস্যার্থে স্ত্রীকে ত্যাগ করে চলে গেলেন। এই পুত্রের নাম হলো আস্তিক। 'অস্তি' অর্থাৎ ঈশ্বরে বিশ্বাস আছে বলে এঁর নাম হলো আস্তিক । মহাভারতে আছে

- বাসুকির জরৎকারু নামে এক ভগিনী ছিল। জরৎকারু বিবাহ ইচ্ছা প্রকাশ করলে, বাসুকি বহু অন্বেষণের পর মহর্ষি জরৎকারুকে পেয়ে তাঁর হাতে ভগিনীকে সমর্পণ করলেন। স্ত্রী ও স্বামী একই নামধারী হলেন। মহর্ষি জরৎকারু স্ত্রীকে বললেন, তুমি কখনও আমার অপ্রিয় কিছু করবে না, যদি কর তবে তোমাকে ত্যাগ করে চলে যাব। একদিন মহর্ষি জরৎকারু স্ত্রীর ক্রোড়ে মাথা রেখে নিদ্রা যাচ্ছিলেন, এমন সময় সন্ধ্যা উপস্থিত হলো। পাছে সন্ধ্যা বন্দনার সময় অতিক্রান্ত হয়ে যায়, এই ভয়ে স্ত্রী স্বামী জরৎকারুকে জাগিয়ে সন্ধ্যা বন্দনার কথা জানিয়ে দিলেন। মহর্ষি বললেন, তাঁর নিদ্রা ভঙ্গ করে স্ত্রী তাঁকে অবমাননা করেছেন ; তাই তিনি স্ত্রীকে ত্যাগ করে চলে যাবেন। যাবার সময় স্ত্রীকে বলে গেলেন, তাঁর গর্ভে এক তেজস্বী বেদজ্ঞ পুত্র আছে। যথাকালে জরৎকারু গর্ভে মহাতেজস্বী এক পুত্র জন্ম গ্রহণ করল। মহর্ষি জরৎকারু চলে যাবার সময় তাঁর স্ত্রীর গর্ভস্থ পুত্রকে লক্ষ করে 'অস্তি' (আছে) বলেছিলেন, সেই জন্য তাঁর পুত্রের নাম হলো আস্তিক। এই দেবী অত্যন্ত সুন্দরী বলে এঁর নাম জগৎগৌরী। শিবের শিষ্যা বলে শৈবী; বিষ্ণুভক্তা বলে বৈষ্ণবী; জনমেজয়ের যজ্ঞে নাগদের প্রাণরক্ষা করে ছিলেন বলে নাগেশ্বরী; বিষ হরণকারী বলে বিষহরী ; মহাদেবের কাছ হতে সিদ্ধযোগ পেয়েছিলেন বলে সিদ্ধযোগিনী, কশ্যপের মানস কন্যা বলে মনসা। ব্রিটিশ জাদুঘরের সংগ্রহশালায় মনসা দুহাতবিশিষ্টা। কলকাতার জাতীয় জাদুঘরে ও বীরভূমে দেবীর নিদর্শন পাওয়া গেছে।

চিত্র: মনসা (উৎস : জাদুঘর ২৮ : ৩৮১)

তারা

তারা দেবী কালীর একটি বিশিষ্ট রূপ। তারা দশমহাবিদ্যার দ্বিতীয় মহাবিদ্যা। ময়নামতি জাদুঘরে সংরক্ষিত বর্ণনানুসারে–

> তারা মূর্তিটি বেলে পাথরে তৈরী। মূর্তিটির পরিমাপ ১৬৮ সেমি:x ৫৩ সেমি:। প্রতিকূল আবহাওয়ায় মূর্তিটি যথেষ্ট ক্ষয়-প্রাপ্ত। দুহাত বিশিষ্ট মূর্তিটি ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিতে দাঁড়ানো। বাম হাতে অর্ধ-প্রস্ফুটিত পদ্ম ধারণ করে আছে এবং ডান হাতে বরদ মুদ্রায় বিধৃত হয়েছে। মূর্তিটি কুমিল্লা জেলার কচুয়া থানার লাজাইক গ্রাম থেকে প্রাপ্ত (জাদুঘর ২৪ : ৩৭৫)

পুরাণানুসারে তারা দেবগুরু বৃহস্পতির স্ত্রী। চন্দ্র একবার তারার সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে হরণ করেন। বৃহস্পতি চন্দ্রের প্রতি ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁকে শাস্তি দেবার জন্য দেবতাদের সাহায্য ভিক্ষা করেন। দেবতা ও ঋষিগণ তারাকে প্রত্যর্পণের জন্য চন্দ্রকে অনুরোধ করলে, চন্দ্র অসম্মত হন এবং দৈত্যগুরু শুক্রাচর্যের সাহায্য কামনা করেন। রুদ্রদেব বৃহস্পতির পক্ষ নিয়ে যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। পুনরায় দেবাসুরের মধ্যে ভীষণ যুদ্ধের সম্ভাবনা দেখে ব্রহ্মা মধ্যস্থ হয়ে বিবাদ মিটিয়ে দেন ও তারাকে বৃহস্পতির হস্তে প্রত্যর্পণ করেন। ইতিমধ্যে তারা অন্তঃসত্ত্বা হওয়ায় বৃহস্পতি তাকে গর্ভ ত্যাগ করে তাঁর নিকট আসতে বলেন। তারা গর্ভ ত্যাগ করে প্রত্যাবর্তন করার পর এক পুত্রের জন্ম হয় . এই পুত্রের নাম দস্যু সুন্তম। ব্রহ্মা তরারকে প্রশ্ন করে জানতে পারেন যে, এই পুত্র চন্দ্রের ঔরসজাত তখন চন্দ্র এই পুত্রকে গ্রহণ করে তার নামকরণ করেন বুধ। ইনি পঞ্চকন্যাদের অন্যতমা। পুরাণমতে দশমহাবিদ্যায় দ্বিতীয় মহাবিদ্যা সতী দক্ষযজ্ঞে যাবার জন্য মহাদেবর নিকট বরাবর অনুমতি চেয়েছিলেন: কিন্তু মহাদেব অনুমতি না দেওয়াতে সতী মহাদেবেকে ভয় দেখানোর জন্য দশমহাবিদ্যার রূপ ধারণ করেন -এর মধ্যে একটি তারা রূপ। হিন্দুধর্মাবলম্বীদের বিশ্বাস রয়েছে প্রাতঃকালে উঠে তারা নাম করলে সেদিন মঙ্গল হয়।

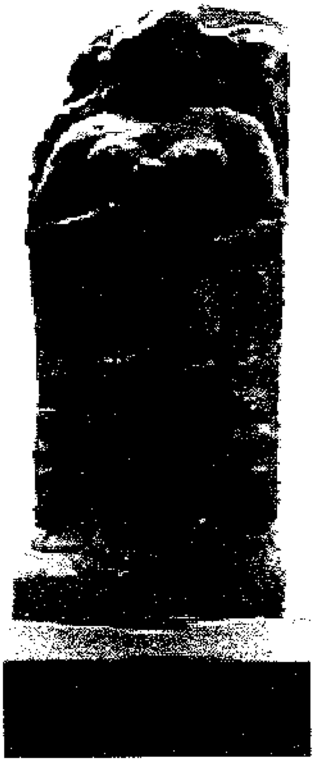

চিত্র : তারা (উৎস : জাদুঘর ২৪ : ৩৭৫)

উপসংহার

প্রত্নতাত্ত্বিক ইতিহাস-ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ বৃহত্তর কুমিল্লা জেলা। বাংলাদেশের মানচিত্রে এটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। এখানে ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে আছে ১৪২টি প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান। বৃহত্তর কুমিল্লার তিনটি জেলায়ই ভারতভাগের আগ পর্যন্ত হিন্দু অধ্যুষিত ছিল। সে হিসেবে হিন্দুরা বিভিন্ন দেবদেবীর ভাস্কর্য গড়ে পূজা করত। ভাস্কর্য তৈরির ইতিহাস শিল্প-নৈপুণ্যতার ইতিহাস। ভাস্কর্য তৈরির পেছনে তাঁদের যেমন শিল্পমন ছিল তেমনি ভক্তিমার্গের সাধনাও ছিল। বৃহত্তর কুমিল্লার প্রাচীন মন্দিরগুলো তার প্রমাণ। এ প্রসঙ্গে স্বামী নির্ম্মলানন্দ বলেছেন– 'মূর্তির মধ্যকার চৈতন্যশক্তি সাধকের অন্তরে ভক্তিভাব জাগ্রত করে' (নির্ম্মলানন্দ ১৪২৪ : ১২২)। এ সমস্ত নানা চেতনাবোধ থেকেই ভাস্কর্যসমূহ তৈরী হয়েছে বলে ধারণা করা হয়। কুমিল্লার বিখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান ময়নামতি ছাড়াও জাদুঘরে প্রাপ্ত তথ্যানুসারে হিন্দু দেবদেবীর ভাস্কর্য জেলার বিভিন্ন জায়গা থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। হরগৌরী ও গণেশ কুমিল্লার চান্দিনা থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে, সূর্য কুমিল্লার মুরাদনগর থেকে, ত্রিবিক্রম বিষ্ণু কুমিল্লার লাকসাম থেকে, হেরুক ও তারা কুমিল্লার কচুয়া থেকে, মারীচী কুমিল্লার সেনানিবাস থেকে, নন্দী, মহিষমর্দিনী ও মনসা কুমিল্লার ময়নামতি থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এ সমস্ত দেবতা বৈদিক ও পৌরাণিক দেবতা হিসেবে স্বীকৃত। রামায়ণ ও মাহাভারতের দেবতা বৈদিক দেবতা এবং পুরাণের পৌরাণিক দেবতা। এদের মধ্যে হেরুক, মারীচী এই দুই দেবতার ভাস্কর্য বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরাও তাঁদের গৃহে রাখত। কেউ কেউ মনে করছেন পূজার পাশাপাশি সৌন্দর্য বর্ধনের জন্যও দেবদেবীর ভাস্কর্য গৃহে রাখত। তবে হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা পূজার নিমিত্তে মন্দিরে এবং গৃহে ভাস্কর্য তৈরী করে পূজা করত। ময়নামতি জাদুঘরে খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শতকের তৈরি ভাস্কর্যগুলো পাওয়া যায়। এখানে তৎকালীন সময়ে সামাজিক ও ব্যক্তি পর্যায়ে দেবদেবীর ভাস্কর্য যে অনুপম নিদর্শন দেখা যায়, তা আমাদের ইতিহাস ঐতিহ্যের অমূল্য সম্পদ।

গ্রন্থপঞ্জি

আহম্মেদ, নাজিমউদ্দিন। (১৯৯৭) মহাস্থান, ময়নামতী, পাহাড়পুর। ঢাকা: প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর

ইসলাম, সিরাজুল (২০০৪)। বাংলাপিডিয়া, [১০ম খণ্ড]। ঢাকা : বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি

নির্ম্মলানন্দ, স্বামী। (১৪২৪)। দেবদেবী ও তাঁদের বাহন। কোলকাতা : শ্রী শ্রী প্রণব মঠ

বেগম, আয়শা। (২০১০)। প্রত্ননিদর্শন : কুমিল্লা। ঢাকা : বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন

ভট্টাচার্য, হংসনারায়ণ। (১৯৮২)। হিন্দুদের দেবদেবী, উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ [প্রথমপর্ব]। কলকাতা : ফার্মা কে এল এম প্রাইভেট লিমিটেড

সরকার, দিনেশ চন্দ্র (১৯৮২)। পাল পূর্ব যুগের বংশানুচরিত। কলকাতা : সাহিত্যলোক

হোসেন, মোঃ মোশারফ। (২০১৯)। হিন্দু জৈন বৌদ্ধ মূর্তি তাত্ত্বিক বিবরণ (পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ)। ঢাকা : দিব্য প্রকাশ

ময়নামতি জাদুঘর, সংরক্ষণ নম্বর ৩৮১, প্রদর্শনী আধার নম্বর ৩২

ময়নামতি জাদুঘর, সংরক্ষণ নম্বর ৭৬৭, প্রদর্শনী আধার নম্বর ৩৬

ময়নামতি জাদুঘর, সংরক্ষণ নম্বর ৭৭২, প্রদর্শনী আধার নম্বর ১৭

ময়নামতি জাদুঘর, সংরক্ষণ নম্বর ৩৭৮, প্রদর্শনী আধার নম্বর ৩৬

ময়নামতি জাদুঘর, সংরক্ষণ নম্বর ৭৬৫, প্রদর্শনী আধার নম্বর ৩৬

ময়নামতি জাদুঘর, সংরক্ষণ নম্বর ২৯৯৭, প্রদর্শনী আধার নম্বর ২৫

ময়নামতি জাদুঘর, সংরক্ষণ নম্বর ৩৮৩, প্রদর্শনী আধার নম্বর ২৭

ময়নামতি জাদুঘর, সংরক্ষণ নম্বর ৩৮৭, প্রদর্শনী আধার নম্বর ২৮

ময়নামতি জাদুঘর, সংরক্ষণ নম্বর ৩৮১, প্রদর্শনী আধার নম্বর ২৮

ময়নামতি জাদুঘর, সংরক্ষণ নম্বর ৩৭৫, প্রদর্শনী আধার নম্বর ২৪

Bhattacharyya,A. (1977). Historical Geography of Ancient Early Mediaeval Bengal. Calcutta : Sanskrit Pustak Bhandar

Morrison, B. (1980). Political Centers and Cultural Regions in Early Bengal. Delhi : Rawat Publications